بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ জুন, ২০১৯ মোতাবেক ১৪ এহসান, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবায় আমি হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-এর বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করছিলাম, আর এ প্রেক্ষিতে তায়েফ সফরের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছিল, যাতে তিনিও মহানবী (সা.)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন। তায়েফ সফরের আরো কিছুটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা যা সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, সেটির আলোকে বর্ণনা করছি:

শে'বে আবি তালেব থেকে বের হওয়ার পর মহানবী (সা.) তায়েফের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন। যখন এই অবরোধ প্রত্যাহার হয় এবং মহানবী (সা.) নিজের চলাফেরার ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করেন তখন তিনি তায়েফে গিয়ে সেখানকার লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তায়েফ বিখ্যাত একটি জায়গা যা মক্কা হতে ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত আর সে যুগে এখানে বনু সাকিফ গোত্র বসবাস করতো। কাবার বিশেষত্বকে বাদ দিলে, শহরের দৃষ্টিকোণ থেকে তায়েফ মক্কার সমপর্যায়ের শহর ছিল আর সেখানে অনেক প্রভাবশালী ও বিত্তবান লোকেরা বসবাস করত। আর তায়েফের এই গুরুত্বের কথা স্বয়ং মক্কাবাসীরাও স্বীকার করত, আর এটি মক্কাবাসীদেরই কথা যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করেছেন যে,

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (সূরা আয যুখরুফ : ৩২)

অর্থাৎ এই কুরআন যদি খোদার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে তাহলে কেন এটি মক্কা অথবা তায়েফের সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির প্রতি অবতীর্ণ হয় নি? মোটকথা নবুয়্যতের ১০ম বছরের শাওয়াল মাসে মহানবী (সা.) তায়েফে যান। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তিনি একা গিয়েছিলেন আবার কোন কোন বর্ণনা অনুসারে যায়েদ বিন হারেসা (রা.)ও সাথে ছিলেন। সেখানে তিনি (সা.) ১০ দিন অবস্থান করেন এবং শহরের অনেক নেতার সাথে একের পর এক সাক্ষাৎ করেন কিন্ত মক্কার মতো সেই শহরের ভাগ্যেও তখন ইসলাম গ্রহণ করা ধার্য ছিল না। তাই সবাই অস্বীকার করে, বরং ঠাট্টাবিদ্রূপ করে। অবশেষে মহানবী (সা.) তায়েফের সবচেয়ে বড় নেতা আব্দে ইয়ালীল বা হাদীস অনুসারে ইবনে আব্দে ইয়ালীলের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে-ও স্পষ্ট ভাষায় না করে দেয়, বরং উপহাসের ছলে বলে, আপনি যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে আপনার সাথে কথা বলার ধৃষ্টতা আমার নেই আর যদি মিথ্যা হয়ে থাকেন তাহলে তো কথা বলার কোন প্রয়োজনই নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই। এরপর কোথাও আবার শহরের যুবকদের ওপর মহানবী (সা.)-এর কথা প্রভাব বিস্তার না করে -এই ধারণা থেকে সে মহানবী (সা.) কে বলে, আপনার এখান থেকে চলে যাওয়াই উত্তম হবে। কেননা এখানকার কেউই আপনার কথা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়। আর এরপর সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি শহরের ভবঘুরে ও বখাটে লোকদের তাঁর পিছনে লেলিয়ে দেয়। মহানবী (সা.) শহর থেকে বের হতেই এই লোকেরা চিৎকার চেচামেচি করতে করতে তাঁর

পিছু ধাওয়া করে এবং তাঁকে পাথর মারতে থাকে। এতে তার পুরো শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। পূর্ববর্তী বর্ণনা অনুসারে হযরত যায়েদ বিন হারেসা সাথে ছিলেন। মহানবী (সা.) কে প্রস্তরাঘাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তার মাথায়ও পাথর লাগে। যাহোক তারা লাগাতার তিন মাইল পর্যন্ত পাথর ছুড়তে ছুড়তে তাঁর পেছনে পেছনে আসতে থাকে ও গালমন্দ করতে থাকে।

তায়েফ হতে ৩ মাইল দূরে মক্কার নেতা উতবা বিন রাবিয়ার একটি বাগান ছিল। মহানবী (সা.) তাতে এসে আশ্রয় নেন আর অত্যাচারী লোকেরা ক্লান্তশ্রান্ত হয়ে চলে যায়। এখানে একটি ছায়াঘন স্থানে দাঁড়িয়ে তিনি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এভাবে দোয়া করেন যে,

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِي , وَقِلَّةَ حِيلَتِي , وَهَوَانِي عَلَى النَّاسِ ، اللَّهُمَّ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِينَ وَأَنْتَ رَبِّي

অর্থাৎ হে আমার প্রভু! আমি আমার শক্তির ঘাটতি ও উপায় হীনতা এবং মানুষের বিপরীতে আমার অসহায়ত্বের অনুযোগ তোমার সমীপেই করছি। হে আমার খোদা! সবচেয়ে বেশি দয়াময় এবং দুর্বল ও অসহায়দের তুমিই একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ও রক্ষাকারী। তুমিই আমার প্রভু প্রতিপালক, আমি তোমারই চেহারার জ্যোতিতে আশ্রয় প্রার্থী কেননা কেবল তুমিই অন্ধকার দূর করে থাক এবং মানুষকে ইহজগত ও পরজগতের কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী বানিয়ে থাক।

উতবা ও শায়বা তখন তাদের এই বাগানে উপস্থিত ছিল। তারা যখন মহানবী (সা.) কে এ অবস্থায় দেখে তখন দূরসম্পর্কের আত্মীয় বা নিকটাত্মীয় হিসেবে হোক বা জাতিগত আত্মভিমানের কারণেই হোক অথবা অন্য কোন কারণেই হোক না কেন তারা আদ্দাস নামের তাদের একজন খ্রিষ্টান ক্রীতদাসের হাতে একটি পেয়ালায় কিছু আঙ্গুর দিয়ে তাঁর কাছে পাঠায়। মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করেন আর আদ্দাসকে সম্বোধন করে বলেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী এবং কোন ধর্মের অনুসারী? সে বলে, আমি নেয়নোয়ার অধিবাসী এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারী। মহানবী (সা.) বলেন, এটি কি সেই নেয়নোয়া যা খোদার পুণ্যবান বান্দা ইউনুস বিন মাত্তার নিবাস ছিল? তখন আদ্দাস বলে, হ্যাঁ। এরপর সে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করে যে, ইউনুস (আ.) সম্পর্কে আপনি কীভাবে জানেন? মহানবী (সা.) বলেন, তিনি আমার ভাই ছিলেন, কেননা তিনিও আল্লাহ্‌র নবী ছিলেন আর আমিও আল্লাহ্‌র নবী। এরপর তিনি (সা.) তাকে ইসলামের বাণী পৌঁছান, যা তার ওপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে আর সে আন্তরিকতার আতিশয্যে সামনে এগিয়ে মহানবী (সা.)-এর হাতে চুমু খায়। উতবা এবং শায়বাও দূরে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য অবলোকন করছিল। এরপর আদ্দাস যখন তাদের কাছে ফিরে যায় তখন তারা বলে, হে আদ্দাস! তোমার কী হয়েছিল যে, তুমি সে ব্যক্তির হাতে চুমু খাচ্ছিলে? এই ব্যক্তি তোমার ধর্ম নষ্ট করে দিবে যদিও তোমার ধর্ম তার ধর্মের চেয়ে উত্তম।

এরপর কিছুক্ষণ মহানবী (সা.) সেই বাগানে বিশ্রাম নেন। অতঃপর তিনি (সা.) সেখান থেকে যাত্রা করেন এবং নাখলায় পৌঁছেন যা মক্কা থেকে এক মনযিল বা ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত এবং সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেন। এরপর নাখলা থেকে যাত্রা করে তিনি (সা.) হেরা পর্বতে আসেন আর যেহেতু তায়েফ সফরের আপাত-ব্যর্থতার কারণে মক্কাবাসীদের ধৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা ছিল, তাই তিনি (সা.) সেখান থেকে মুত'এম বিন আদীকে সংবাদ পাঠান যে, আমি মক্কায় প্রবেশ করতে চাই, এ কাজে তুমি কি আমাকে সাহায্য করতে পারো? মুত'এম পাক্কা কাফের ছিল কিন্তু স্বভাবে ছিল ভদ্র । আর এমতাবস্থায় অর্থাৎ কেউ

আশ্রয় চাইলে অস্বীকার করা বা আশ্রয় না দেয়া আরবের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের প্রকৃতি বিরোধী ছিল। মোটকথা এটি আরবদের মাঝে সেই যুগেও অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগেও একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাই সে তার সন্তানদের এবং আত্মীয়স্বজনদের সাথে নেয় এবং সকলে সশস্ত্র হয়ে কা'বার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর মুহাম্মদ (সা.)কে ডেকে পাঠায় যে, আসুন, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিচ্ছি। মহানবী (সা.) আসেন আর কা'বা প্রদক্ষিণ করেন আর সেখান থেকে মুত'এম এবং তার সন্তানদের সাথে তরবারির ছায়ায় নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। পথিমধ্যে আবু জেহেল মুত'এমকে এই অবস্থায় দেখে বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মুহাম্মদ'কে (সা.)-কে কেবল আশ্রয় দিয়েছ, না কি তার অনুসারী হয়ে গিয়েছ? মুত'এম বললো, আমি কেবল তার আশ্রয়দাতা, অনুসারী নই। তখন আবু জেহেল বলল, ঠিক আছে, তাহলে কোন সমস্যা নেই। যাইহোক মোটকথা মুত'এম অবিশ্বাসের মাঝেই মৃত্যুবরণ করে; তবে এটি অবশ্যই তার একটি পুণ্য ছিল। হযরত যায়েদ যখন হিজরত করে মদীনায় পৌঁছেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদামে'র কাছে অবস্থান করেন, তবে কারো কারে মতে তিনি হযরত সা'দ বিন খায়সামার কাছে অবস্থান করেন। হযরত উসায়েদ বিন হুযায়েরের সাথে মহানবী (সা.) তাকে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেন। কেউ কেউ লিখেছে যে, মহানবী (সা.) হযরত হামযা'র সাথে তার ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। অর্থাৎ হযরত হামযা'কে তার ভাই বানিয়ে দেন। এ কারণেই উহুদের যুদ্ধের দিন হযরত হামযা যুদ্ধের সময় হযরত যায়েদের পক্ষে ওসিয়্যত করেছিলেন। এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে আরো লিখেন,

মদীনা পৌঁছানোর কিছুদিন পর মহানবী (সা.) যায়েদ বিন হারেসাকে কিছু টাকা দিয়ে মক্কায় প্রেরণ করেন, যিনি কয়েকদিনের মধ্যে তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে সাথে নিয়ে নিরাপদে মদীনা পৌঁছে যান। তার সাথে আব্দুল্লাহ্ বিন আবি বকরও হযরত আবু বকরের পরিবার পরিজন'কেও নিয়ে মদীনা পৌঁছে যান।

হযরত বারা'আ (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন মহানবী (সা.) যুল কা'দায় ওমরাহ করতে মনস্থ করলেন তখন মক্কার অধিবাসীরা মহানবী (সা.) কে মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তিনি (সা.) তাদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করেন যে, তিনি (সা.) পরবর্তী বছর ওমরাহ্'র উদ্দেশ্যে আসবেন এবং মক্কায় তিন দিন অবস্থান করবেন। যখন চুক্তিনামা লেখা হচ্ছিল তা এভাবে লেখা হয় যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) সন্ধি করেছেন। মক্কাবাসীরা বলে যে, আমরা এই বিষয়টি মানি না। আমরা যদি আপনাকে আল্লাহ্র রসূলই মনে করতাম তাহলে আপনাকে কখনো বাধা দিতাম না। তারা বলে, আমাদের কাছে তো আপনি (শুধু) মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্। তিনি (সা.) বলেন, আমি আল্লাহ্র রসূলও আর মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ও। তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে বলেন, এখান থেকে রসূলুল্লাহ্ শব্দটি মুছে দাও। হযরত আলী (রা.) বলেন, কখনো না, আল্লাহ্র কসম, আমি আপনার উপাধি কখনো মুছব না, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে যে "আল্লাহ্র রসূল" উপাধি দিয়েছেন -তা আমি মুছতে পারবো না। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার কাছ থেকে সেই লিখিত নিয়ে নেন। মহানবী (সা.) ভালো করে লিখতে না জানলেও তিনি (সা.) এভাবে লিখেন, এগুলো হলো সেই শর্ত যা মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ নির্ধারণ করেছেন। মক্কায় কেউ অস্ত্র নিয়ে আসবে না, কেবল খাপে রাখা তরবারি ছাড়া। আর মক্কাবাসীদের কাউকে সাথে নিয়ে যাবে না, তারা তাদের সাথে যেতে চাইলেও, আর নিজ সাথীদের কাউকে বাধা দিবে না, যদি সে মক্কায় থেকে যেতে চায়।

মোটকথা এই চুক্তি অনুযায়ী মহানবী (সা.) পরবর্তী বছর মক্কায় প্রবেশ করেন এবং তিন দিনের সময় সমাপ্ত হয়ে যায়। তখন কুরাইশরা হযরত আলীর কাছে আসে এবং বলে, আপনি নিজের সাথি অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-কে বলুন, তিনি যেন এখান থেকে চলে যান; কেননা নির্ধারিত শেষ হয়ে গেছে। তিন দিন অবস্থানের শর্ত ছিল যা শেষ হয়ে গেছে। অতএব মহানবী (সা.) সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে যান। হযরত হামযার কন্যা উমারা, এক বর্ণনায় তার নাম আ'মামাহ বর্ণিত হয়েছে এবং অন্য বর্ণনায় আমাতুল্লাহ্ও দেখা যায়, তাঁর অর্থাৎ মহানবী (সা.) এর পেছনে পেছনে আসেন এবং বলতে থাকেন হে চাচা, হে চাচা! হযরত আলী (রা.) গিয়ে তার হাত ধরেন এবং হযরত ফাতেমা (আ.) কে বলেন , আপনি চাচার মেয়েকে নিয়ে যান। তিনি তাকে বাহনে চড়িয়ে নেন। তখন হযরত আলী, হযরত যায়েদ আর হযরত জা'ফর হযরত হামযার মেয়েকে নিয়ে বিতণ্ডা আরম্ভ করেন। হযরত আলী (রা.) বলেন, আমিই তাকে নিয়েছি কেননা সে আমার চাচাতো বোন, আর হযরত জা'ফর বলেন, আমার চাচার মেয়ে আর তার খালা আসমা বিনতে উমায়েস আমার স্ত্রী আর হযরত যায়েদ বলেন, মহানবী (সা.) কর্তৃক রচিত ভ্রাতৃত্ববন্ধনের কারণে সে আমার ভাইয়ের মেয়ে। তখন মহানবী (সা.) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, সে তার খালার কাছেই থাকবে, অর্থাৎ হযরত জা'ফর এর কাছেই থাকবে। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, খালা হলো মায়ের স্থলাভিষিক্ত। আর হযরত আলীকে বলেন, তুমি আমার আর আমি তোমার আর হযরত জা'ফরকে বলেন, তুমি চেহারা ও বৈশিষ্ট্যে আমার সাথে সামঞ্জস্য রাখ আর হযরত যায়েদ'কে বলেন, তুমি আমাদের ভাই এবং বন্ধু। হযরত আলী বলেন, আপনি কি হযরত হামযার মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন কি? তিনি (সা.) বলেন, সে আমার দুধ ভাইয়ের মেয়ে আর আমি এই মেয়ের চাচা। এই বর্ণনা বুখারীতেও আছে আর সীরাতুল হালাবিয়াতেও রয়েছে।

হযরত যায়েদ বিন হারেসা হযরত উম্মে আয়মানকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত উম্মে আয়মানের নাম ছিল বারাকাহ আর তিনি তার পুত্র আয়মানের কারণে উম্মে আয়মান ডাক নামে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়ার অধিবাসী ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্র ক্রীতদাসী ছিলেন আর তার মৃত্যুর পর তিনি হযরত আমেনার কাছেই ছিলেন। মহানবী (সা.)-এর বয়স যখন ছয় বছর ছিল তখন তাঁর (সা.) সম্মানিত জননী তাঁকে সাথে নিয়ে দেখাসাক্ষাতের উদ্দেশ্যে মদিনায় নিজ বাপের বাড়ি যান। সেসময় হযরত উম্মে আয়মান সেবিকা হিসাবে সাথে ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি বয়সে ছোটও ছিলেন। মদিনা থেকে ফেরার পথে যখন তারা আবওয়া নামক স্থানে পৌঁছেন, যা মসজিদে নববী থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত, তখন হযরত আমেনা ইন্তেকাল করেন। হযরত উম্মে আয়মান মহানবী (সা.)-কে সেই দু'টি উটে চড়িয়েই মক্কায় ফিরিয়ে আনেন যে দু'টি উটে চড়ে তারা গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের দাবির পূর্বে মক্কায় হযরত উম্মে আয়মানের বিয়ে উবায়েদ বিন যায়েদের সাথে হয়, যিনি নিজেও একজন হাবশী ক্রীতদাস ছিলেন। তাদের ঘরে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে যার নাম ছিল আয়মান। হযরত আয়মান হুনায়েনের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। হযরত উম্মে আয়মানের স্বামীর মৃত্যু হলে তার বিয়ে হযরত যায়েদের সাথে করিয়ে দেয়া হয়। একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত উম্মে আয়মান মহানবী (সা.)-এর সাথে অত্যন্ত স্নেহের আচরণ করতেন এবং তাঁর যত্ন নিতেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতবাসীনিকে বিয়ে করে সুঃখি হতে চায় সে যেন

উম্মে আয়মানকে বিয়ে করে নেয়। অতঃপর একথা শুনে হযরত যায়েদ বিন হারেসা তাকে বিয়ে করেন এবং তাদের ঘরে হযরত উসামার জন্ম হয়। হযরত উম্মে আয়মান মুসলমানদের সাথে হিজরত করে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া গিয়েছিলেন। হিজরতের পর সেখান থেকে মদিনা ফিরে আসেন এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি মানুষকে পানি পান করাতেন এবং আহতদের সেবা শুশ্রূষা করতেন। তিনি খায়বারের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। ২৩ হিজরী সনে যখন হযরত উমর (রা.) শাহাদত বরণ করেন তখন তিনি অনেক কেঁদেছিলেন। মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, তুমি কেন কাঁদছ? তখন তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উমরের শাহাদতের কারণে ইসলাম দুর্বল হয়ে গেছে। হযরত উসমান (রা.)-এর খেলাফতকালের প্রারম্ভে হযরত উম্মে আয়মানের ইন্তেকাল হয়।

হযরত উম্মে আয়মানের সাথে হযরত যায়েদ (রা.)-এর বিয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব যা লিখেছেন তার সারমর্ম হলো, উম্মে আয়মান হলেন সেই নারী যাকে মহানবী (সা.) তার পিতার মৃত্যুর পর এক কৃতদাসীনি হিসাবে উত্তরাধিকারস্বরূপ লাভ করেছিলেন। বড় হয়ে তিনি (সা.) তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং তার সাথে অনেক সদয় ব্যবহার করতেন। পরবর্তীতে উম্মে আয়মানের বিয়ে তাঁর (সা.) মুক্ত ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেসার সাথে হয়ে যায় আর এরপর তার গর্ভে উসামা বিন যায়েদ জন্মগ্রহণ করেন যাকে আলহিব্বু ইবনুল হিব্ব অর্থাৎ প্রেমাস্পদের প্রিয় পুত্র বলা হতো। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উম্মে আয়মানকে দেখে বলতেন, **'ইয়া উম্মা'** অর্থাৎ হে আমার মা! তিনি (সা.) হযরত উম্মে আয়মানের দিকে তাকিয়ে বলতেন, **'হাযিহী বাক্বিয়্যাতু আহলে বাইতি'** অর্থাৎ ইনি হলেন আমার আহলে বায়তের স্মৃতিচিহ্ন। অপর এক বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) এটিও বলতেন যে, **'উম্মা আয়মানা উম্মী বা'দা উম্মী'** অর্থাৎ আমার আসল মায়ের পর উম্মে আয়মানই আমার মা এবং তিনি (সা.) তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার বাড়িতেও যেতেন।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, মুহাজেররা যখন মক্কা থেকে মদিনায় আসেন এবং তাদের হাতে কিছুই ছিল না অথচ আনসাররা জয়গা-জমি ও সম্পদের মালিক ছিলেন; তখন আনসাররা তাদের সাথে চুক্তি করেন যে, তারা প্রত্যেক বছর মুহাজেরদেরকে নিজেদের বাগানের ফল দিবে কিন্তু বাগানে কাজকর্ম তারা নিজেরাই করবেন। বাগানের ফল বা উপার্জন তাদেরকে দিবেন কিন্তু বাগানে পরিশ্রম ও শ্রমিকের কাজ, এর যত্ন নেয়ার কাজ তারা নিজেরাই করবেন, মুহাজেরদের করতে দিবেন না। হযরত আনাস (রা.)-এর মা ছিলেন হযরত উম্মে সুলায়েম যিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবী তালহারও মা ছিলেন। সুতরাং হযরত আনাসের মা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কিছু খেজুরের গাছ দিয়ে রেখেছিলেন। মহানবী (সা.) এই গাছগুলো তাঁর দাইমা হযরত উম্মে আয়মানকে দিয়ে দেন যিনি হযরত উসামা বিন যায়েদের মা ছিলেন। ইবনে শিহাব বলতেন, আমাকে হযরত আনাস বিন মালেক বলেছেন যে, মহানবী (সা.) যখন খায়বারের যুদ্ধ শেষে মদিনা ফিরে যান তখন মুহাজেররা আনসারদের সেই দান ফিরিয়ে দেন অর্থাৎ সেসব ফলবান বৃক্ষ যা তারা নিজেদের বাগান থেকে তাদেরকে দিয়েছিল, তা তারা ফিরিয়ে দেন। তখন তাদের হাতেও কিছুটা অর্থ-সম্পদ এসেছিল। মহানবী (সা.)-ও হযরত আনাসের মাকে তাদের খেজুরগাছ ফেরত দিয়ে দেন আর তার জায়গায় রসূলুল্লাহ্ (সা.)উম্মে আয়মানকে নিজের বাগান থেকে কিছু গাছ দান করেন। বুখারীর অপর এক হাদীসে এর বিস্তারিত বিবরণ এভাবে এসেছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, কোন

কোন সাহাবী বিশেষভাবে কিছু খেজুর গাছ মহানবী (সা.)-এর জন্য নির্ধারণ করে দিতেন। তিনি (সা.) যখন কুরায়যা এবং নাযীর জয় করলেন তখন তাঁর আর এসবের প্রয়োজন রইলো না। তিনি (রা.) বলেন, আমার পরিবারের সদস্যরা আমাকে মহানবী (সা.) এর কাছে গিয়ে তাঁকে বলতে বলে যে, যেসব গাছ তারা মহানবী (সা.)-কে দিয়েছিল সেগুলো বা তা থেকে কিছু গাছ তিনি যেন ফেরত দেন। কেননা, এখন আর তাঁর এসবের প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, যেহেতু এ গাছগুলো মহানবী (সা.) হযরত উম্মে আয়মানকে দিয়ে রেখেছিলেন, একথা শুনে হযরত উম্মে আয়মান আসেন এবং আমার কাঁধে কাপড় পেঁচিয়ে বলেন, আমি এগুলো কখনো দিবো না। সেই সত্তার কসম যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, এ গাছগুলো তুমি আদৌ পাবে না কেননা মহানবী (সা.) এগুলো আমাকে দিয়ে দিয়েছেন বা এমনই কোন কথা বলে থাকবেন। মহানবী (সা.) হযরত উম্মে আয়মানকে বলেন, কোন সমস্যা নেই, তুমি এগুলো ফেরত দিয়ে দাও, তোমাকে যতগুলো গাছ দেয়া হয়েছে আমি তোমাকে অন্য জায়গা থেকে ততগুলো গাছই দিব। কিন্তু তিনি বলতেন, আল্লাহ্‌র কসম! কখনো নয়। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমার ধারণা হলো অবশেষে তিনি (সা.) হযরত আয়মানকে তার চেয়ে দশগুণ বেশি দিয়েছেন বা এমনই কোন কথা বলে থাকবেন যে, আমি তোমাকে দশগুণ বেশি দিব। এরপর এ গাছগুলো ফেরত দেয়া হয়। একটি বর্ণনা রয়েছে যে, পায়ে হেঁটে মদিনায় হিজরত করার সময় হযরত উম্মে আয়মানের খুবই তৃষ্ণা পায়, অত্যন্ত পুণ্যবতী নারী ছিলেন এবং অতি বয়োবৃদ্ধ মহিলা ছিলেন, আল্লাহর সাথে তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। তখন তার কাছে পানিও ছিল না আর প্রচণ্ড গরম ছিল। তিনি তার মাথার ওপর কোন কিছুর আওয়াজ শুনতে পান আর দেখতে পান যে, আকাশ থেকে বালতির ন্যায় একটি বস্তু তার সামনে ঝুলছিল যা থেকে পানির স্বচ্ছ বিন্দু ঝরে পড়ছিল। তিনি তা থেকে তৃপ্তিসহ পানি পান করেন। তিনি বলতেন, এরপর থেকে আমার কখনো পিপাসা বা তৃষ্ণার কষ্ট হয় নি । কখনো রোজা থাকা অবস্থায়ও তৃষ্ণা পেলে আমি পিপাসার্ত থাকতাম না। সাহাবাদের (রা.) স্মৃতিচারণে কখনো কখনো এই মহিলাদের স্মৃতিচারণও হয়ে থাকে যেন তাদের উন্নত মর্যাদা সম্পর্কে আমরা অবগত হতে পারি আর এজন্যই আমি বদরী সাহাবীদের (রা.) সাথে যে মহিলাদের উল্লেখ হয়েছে তাদের কথাও পাশাপাশি উল্লেখ করে থাকি। হযরত উম্মে আয়মানের জিহ্বায় কিছুটা জড়তা ছিল। তিনি যখন কারো কাছে যেতেন, তখন 'সালামুল্লাহে আলাইকুম' বলার পরিবর্তে জড়তার কারণে 'সালামুল্লাহ্‌ আলায়কুম' বলতেন। পূর্বে 'সালামুল্লাহে আলাইকুম' বলারই রীতি ছিল। অতএব মহানবী (সা.) তাকে 'সালামুল্লাহে আলায়কুম' এর পরিবর্তে 'সালামুন আলাইকুম' অথবা 'আসসালামু আলাইকুম' বলার অনুমতি দেন আর এখন সেই রীতিই প্রচলিত আছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন মহানবী (সা.) পানি পান করছিলেন। সে সময় হযরত উম্মে আয়মান (রা.) তাঁর কাছে ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাকেও পানি পান করান। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এতে আমি তাকে বললাম, তুমি মহানবী (সা.)-কে এভাবে পানি পান করাতে বলছ? এতে তিনি বলেন, আমি কি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর অধিক সেবা করি নি? তখন মহানবী (সা.) বলেন, তুমি সঠিক বলেছ। এরপর তিনি (সা.) তাকে পানি পান করান। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত উম্মে আয়মান (রা.) কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় , মহানবী (সা.) এর জন্য আপনি কেন কান্না করছেন। তিনি বলেন, আমি

জানতাম, নবী করীম (সা.) অবশ্যই মৃত্যু বরণ করবেন। কিন্তু আমি এ কারণে কাঁদছি যে, ওহী আমাদের প্রতি ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে, অর্থাৎ মহানবী (সা.)এর বিয়োগব্যথা তো আছেই কিন্তু একইসাথে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যে নতুন নতুন বাণী আমরা পেতাম অর্থাৎ ওহী হতো, সেই ধারাবাহিকতা এখন বন্ধ হয়ে গেছে; এই কারণে আমি ক্রন্দন করছি।

হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর একবার হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমাদের সাথে হযরত উম্মে আয়মান (রা.)-এর কাছে চল তার সাথে সাক্ষাৎ করবো, যেমটি কি-না মহানবী (সা.) তার সাথে সাক্ষাৎ করতেন। আমরা যখন তার কাছে পৌঁছলাম, তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। এতে আমরা উভয়েই তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, আপনি কেন কাঁদছেন? আল্লাহ্ তা'লার কাছে যা কিছু রয়েছে, তা তাঁর রসূলের জন্য উত্তম। হযরত উম্মে আয়মান (রা.) বলেন, আমি এ কারণে কাঁদছি না যে, আল্লাহ্র কাছে মহানবী (সা.) এর জন্য উত্তম প্রতিদান রয়েছে বলে আমি অবগত নই। আমি যেমনটি উল্লেখ করেছি, পুণ্যের ক্ষেত্রে তাঁরও অনেক বড় পদমর্যাদা ছিল। তিনি বলেন, আমি তো এজন্য কাঁদছি যে, এখন আকাশ থেকে ওহী আসা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি তাদের দু'জনকেও কাঁদিয়ে দিলেন আর তারা দু'জনও কাঁদতে আরম্ভ করেন।

হযরত উসামা (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর মাঝে গাত্রবর্ণের বেশ পার্থক্য ছিল। মা যেহেতু ইথিওপিয়ার অধিবাসীনি ছিলেন, আফ্রিকান ছিল আর উসামা ছিলেন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী, এ কারণে পিতা-পুত্রের মাঝে পার্থক্য ছিল। তার গায়ের বর্ণ মায়ের রং ঘেষা ছিল, যার কারণে কেউ কেউ হযরত উসামার বংশ নিয়ে আপত্তি করতো আর বলতো যে, তিনি হযরত যায়েদ (রা.) এর পুত্র নন বা আপত্তির খাতিরেই আপত্তি উত্থাপিত হতো আর মুনাফেকরাও আপত্তি করতো। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) একদিন আমার কাছে আসেন আর তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ছিলেন। তিনি বলেন, হে আয়েশা! এখনই মুজাজ্জেজ মুদলাজি আমার কাছে এসেছিল। সে উসামা বিন যায়েদ এবং যায়েদ বিন হারেসাকে এই অবস্থায় দেখেছে যখন তাদের ওপর একটি চাদর ছিল। গরমের কারণে বা বৃষ্টির কারণে অথবা অন্য কোন কারণে তারা একটি চাঁদর জড়িয়ে রেখেছিলেন এবং মুখ ঢেকে রেখেছিলেন যদ্বারা তারা নিজেদের মস্তক আবৃত করে রেখেছিলেন আর চেহারাও দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু তাদের উভয়ের পা ছিল অনাবৃত, শুধুমাত্র পা (চাদরের) বাইরে ছিল। তখন সে বলে, নিশ্চিতরূপে এই পাগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। অর্থাৎ উভয়ের পায়ের মধ্যেই যথেষ্ট মিল রয়েছে। এতে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত ছিলেন অর্থাৎ উসামার প্রতি যেসব আপত্তি করা হতো আজ সেসব আপত্তির অবসান ঘটেছে। এক জগৎপূজারী ব্যক্তি এবং দেহাবয়ব বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরও সাক্ষ্য রয়েছে। এ ব্যক্তি এক দক্ষ দেহাবয়ব বিশেষজ্ঞ আর আরব সমাজে এটি একটি চূড়ান্ত রায় বলে গণ্য হতো। এমনিতে অবশ্য কিছুই আসে যায় না কিন্তু জগৎপূজারীদের মুখ বন্ধ করার জন্য, মুনাফিকদের বন্ধ করার জন্য এটি একটি প্রমাণ পাওয়া গেছে যার ফলে মহানবী (সা.) খুবই আনন্দিত ছিলেন। হযরত যায়েদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর মুক্ত কৃতদাস এবং পালক পুত্রও ছিলেন। তিনি (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-কে হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ-এর সাথে বিয়ে করিয়েছিলেন। কিন্তু এই বিয়ে বেশিদিন টিকেনি এবং হযরত যায়েদ (রা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে তালাক দেন। এই বিয়ে এক বছর বা এর চেয়ে কিছু বেশি সময় টিকেছিল। এরপর মহানবী (সা.) স্বয়ং হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)-

কে বিয়ে করেছিলেন। বিভিন্ন সূত্র ও বরাতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহের (রা.) সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ করেছেন এর বিস্তারিত বিবরণ কিছুটা এরূপ:

হিজরতের ৫ম বছরে বনু মুস্তালিক-এর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে, যা ৫ম হিজরীর শাবান মাসে ঘটেছিল, মহানবী (সা.) হযরত যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)-কে বিয়ে করেন। হযরত যয়নব (রা.) মহানবী (সা.) ফুপু উমায়মা বিনতে আব্দুল মুত্তালিবের কন্যা ছিলেন। আর খুবই পুণ্যবতী ও খোদাভীরু হওয়া সত্ত্বেও তার স্বভাবে কিছুটা হলেও পারিবারিক বড়াই এর ভাব পরিলক্ষিত হতো। এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর স্বভাব এরূপ ধ্যানধারণা থেকে সম্পূর্ণভাবে পবিত্র ছিল। যদিও তিনি পারিবারিক অবস্থানকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার যোগ্য জ্ঞান করতেন কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানের বা শ্রেষ্ঠত্বের সত্যিকার মানদণ্ডের ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত গুণ, ব্যক্তিগত খোদাভীতি ও পবিত্রতার ওপর। যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (সূরা আল্ হুজুরাত: ১৪)

অর্থাৎ হে লাকসকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সর্বাধিক মুত্তাকী বা খোদাভীরু সেই সবচেয়ে বড় ও সম্মানিত। অতএব তিনি নির্দ্বিধায় নিজের মুক্ত কৃতদাস হযরত যায়েদ বিন হারেসার সাথে তাঁর এই আত্মীয়া অর্থাৎ যয়নব বিনতে জাহ্শ (রা.)'র বিয়ের প্রস্তাব দেন। প্রথমে যয়নব (রা.) নিজের পারিবারিক আভিজাত্যের বা বংশ গৌরবের কথা চিন্তা করে এটি (অর্থাৎ প্রস্তাব) অপছন্দ করেন। কিন্তু অবশেষে মহানবী (সা.)-এর গভীর আকাঙ্ক্ষা দেখে সম্মত হন। যাহোক, মহানবী (সা.)-এর আকাঙ্ক্ষা এবং প্রস্তাব অনুসারে যয়নব এবং যায়েদের বিয়ে হয়ে যায়। যয়নব (রা.) যদিও এই সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার জন্য ভদ্রতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন কিন্তু যায়েদ (রা.) নিজের মতো করে ধরে নেন যে, হযরত যয়নব (রা.)'র হৃদয়ে এখনও এই সংশয় বিদ্যমান রয়েছে যে, আমি একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে এবং মহানবী (সা.)-এর নিকটাত্মীয়, আর হযরত যায়েদ (রা.) একজন মুক্ত কৃতদাস মাত্র এবং আমার সমপর্যায়ের নন। অপরদিকে স্বয়ং হযরত যায়েদ (রা.)'র হৃদয়েও হযরত যয়নব (রা.)'র বিপরীতে নিজের অবস্থান নিচু বা ছোট হওয়ার হীনমন্যতা ছিল আর এই অনুভব ধীরে ধীরে আরো বদ্ধমূল হয়ে তাদের পারিবারিক জীবনকে নিরানন্দ করে তুলেছিল আর স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততা লেগেই থাকতো। আর এই অসহনীয় অবস্থা যখন অনেক বেশি বেড়ে যায় তখন যায়েদ বিন হারেসা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হন আর নিজের ধারণা অনুযায়ী যয়নবের ব্যবহারের বিষয়ে অভিযোগ করে তাকে তালাক দেওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন। আরেকটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এই অভিযোগও করেন যে, যয়নব কর্কশ ভাষা ব্যবহার করেন তাই আমি তাকে তালাক দিতে চাই। এই অবস্থা জেনে মহানবী (সা.)-এর স্বভাবতই কষ্টও হয় কিন্তু তিনি যায়েদ (রা.)-কে তালাক দিতে বারণ করেন। আর সম্ভবত একথা অনুভব করে যে, যায়েদের পক্ষ থেকে সংসার-ধর্ম পালনের চেষ্টায় ঘাটতি রয়েছে, তিনি (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-কে উপদেশ দেন যে, আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং খোদাভীতির সাথে যেভাবে পারো সংসার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা কর। অতএব পবিত্র কুরআনেও তাঁর এই বাক্যগুলো বর্ণিত হয়েছে যে, أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ (সূরা আল্ আহযাব: ৩৮) অর্থাৎ হে যায়েদ! নিজের স্ত্রীকে তালাক দিও না এবং খোদার তাকওয়া অবলম্বন কর। তাঁর এই উপদেশের কারণ এটিই ছিল যে, প্রধানত নীতিগতভাবে মহানবী (সা.) তালাক'কে অপছন্দ করতেন। কাজেই, একবার তিনি

বলেছিলেন, **"আবগাযুল হালালে ইলাল্লাহেত্ তালাক"**। অর্থাৎ সকল বৈধ জিনিসের মাঝে খোদার সবচেয়ে অপছন্দ হচ্ছে তালাক। এ কারণেই ইসলামে শুধুমাত্র চূড়ান্ত চিকিৎসা হিসেবে এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত যেমনটি ইমাম হোসেন (রা.)'র পুত্র ইমাম যয়নুল আবেদীন আলী বিন হোসেন এর একটি রেওয়ায়েত রয়েছে আর ইমাম যাহরী এই রেওয়ায়েতকে নীর্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর কাছে যেহেতু পূর্বেই খোদার এই ঐশী ওহী হয়েছিল যে, অবশেষে যায়েদ বিন হারেসা যয়নব (রা.)-কে তালাক দিয়ে দিবেন আর এরপর যয়নবের সাথে তাঁর (সা.) বিয়ে হবে, একারণে নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে বলে জ্ঞান করে তিনি (সা.) এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে দূরত্ববজায় রেখে নিরপেক্ষ থাকতে চাইতেন আর নিজের পক্ষ থেকে পুরোপুরি চেষ্টা করছিলেন যাতে যায়েদ এবং যয়নবের বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে তাঁর (সা.) কোন ভূমিকা যেন আদৌ না থাকে। আর যতদিন পর্যন্ত সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয় ততদিন যেন তারা মানিয়ে চলে এবং সম্পর্ক বহাল থাক। এই ইচ্ছার কারণেই তিনি (সা.) অত্যন্ত জোরালোভাবে যায়েদ (রা.)-কে এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তুমি তালাক দিও না আর খোদাভীতি অবলম্বন করে যেভাবে সম্ভব সংসার কর। মহানবী (সা.)-এর এই আশঙ্কাও ছিল যে, যায়েদের সাথে তালাকের পর যয়নবের সাথে যদি তাঁর বিয়ে হয় তাহলে এ কারণে মানুষ আপত্তি করবে যে, তিনি (সা.) তাঁর পালক পুত্রের তালাকপ্রাপ্তাকে বিয়ে করেছেন আর অযথাই পরীক্ষার পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন বলেন,

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ (সূরা আহযাব: ৩৮)

অর্থাৎ হে নবী! তুমি তোমার হৃদয়ে সেই কথা গোপন রেখেছিলে যা অবশেষে খোদা তা'লা প্রকাশ করে দিয়েছেন। আর তুমি মানুষকে ভয় করতে, অথচ নিশ্চয় খোদা তা'লা অনেক বেশি অধিকার রাখেন যেন তাঁকে ভয় করা হয়।

যাহোক মহানবী (সা.) যায়েদকে আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়া অবলম্বনের নসীহত করে তালাক দিতে বারণ করেন আর যায়েদ তাঁর (সা.) এই নসীহতের আনুগত্য করে নিশ্চুপ হয়ে ফিরে যান। কিন্তু যাদের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাদের মিলিত হওয়া কঠিন, এক ফাটল সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, খুবই কঠিন কাজ ছিল। যা জোড়া লাগার ছিল না তা আর জোড়া লাগে নি। কিছুদিন পর যায়েদ স্ত্রীকে তালাক প্রদান করেন। যয়নবের ইদ্দতকাল শেষ হয়ে গেলে তার বিয়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) এর ওপর পুনরায় ওহী অবতীর্ণ হয় যে, মহানবী (সা.) এর স্বয়ং তাকে বিয়ে করে নেয়া উচিত। আর এই ঐশী নির্দেশে এই প্রজ্ঞার পাশাপাশি, অর্থাৎ এতে হযরত যয়নবের মনস্তুষ্টি হবে এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে বিয়ে করা মুসলমানদের মাঝে দোষের কিছু মনে করা হবে না, এই প্রজ্ঞাও অন্তর্নিহিত ছিল যে, হযরত যায়েদ যেহেতু মহানবী (সা.) এর পালকপুত্র ছিলেন এবং তাঁর (সা.) পুত্র অভিহিত হতেন তাই তিনি (সা.) স্বয়ং যখন তার (অর্থাৎ যায়েদের) তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করবেন তখন মুসলমানদের ওপর কার্যত এর একটি প্রভাব পড়বে যে, কাউকে পুত্র বললেই সে প্রকৃত পুত্র হয়ে যায় না আর প্রকৃত পুত্রের মতো বিধিনিষেধ তার ওপর আরোপিত হয় না। একইসাথে আরবের এই অজ্ঞতাপ্রসূত প্রথা মুসলমানদের মাঝ থেকে পুরোপুরি উঠে যাবে। অতএব ইসলামী ইতিহাসের সবচেয়ে সঠিক রেকর্ড পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে বলা হয়েছে-

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (সূরা আহযাব: ৩৮)

অর্থাৎ যখন যায়েদ যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয় তখন আমরা তোমার সাথে যয়নবের বিয়ে দেই যেন মু'মিনদের জন্য নিজেদের পালকপুত্রদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীদের, যখন তারা তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়, বিয়ে করার ক্ষেত্রে কোন বাধা না থাকে; আর খোদার এই নির্দেশ এভাবেই পূর্ণ হওয়ার ছিল। মোটকথা এই ঐশী ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পর, যাতে মহানবী (সা.)-এর নিজের বাসনা এবং ইচ্ছার কোন হাত ছিল না, তিনি (সা.) যয়নবের সাথে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং হযরত যায়েদের মাধ্যমেই হযরত যয়নবকে বিয়ের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। আর হযরত যয়নবের পক্ষ থেকে সম্মতি জানানোর পর তার ভাই আবু আহমদ বিন জাহাশ তার পক্ষ থেকে ওলী হয়ে চারশত দিরহাম দেনমোহরে মহানবী (সা.) এর সাথে তার বিয়ে দেন। আর এভাবে সেই প্রাচীণ প্রথাকে, যা আরব ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল, মহানবী (সা.) এর ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ইসলামে মূল থেকে উৎপাটন করা হয়েছে।

এখানে এটিও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, সাধারণ ইতিহাসবিদ এবং মুহাদ্দেসদের ধারণা হলো, যয়নবের বিয়ে সম্পর্কে যেহেতু ঐশী ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল আর খোদা তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় এই বিয়ে সংঘটিত হয়েছে তাই তাদের বিয়ের বাহ্যিক রীতি পালন করা হয় নি, কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। নিঃসন্দেহে খোদার নির্দেশে এই বিয়ে হয়েছে আর বলা যেতে পারে যে, আকাশে এই বিয়ে পড়ানো হয়েছে কিন্তু এর কারনে শরীয়তের বাহ্যিক যে আচার-অনুষ্ঠান রয়েছে -তা থেকে অব্যাহতি লাভ হওয়া সম্ভব হতে পারে না কেননা তা-ও খোদা তা'লা কর্তৃকই নির্ধারিত। অতএব ইবনে হিশাম এর রেওয়ায়েত, যার রেফারেন্স পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং যাতে বিয়ের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্মাদিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আর এই যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন এর বিপরীতে হযরত যয়নব এই গর্ব করতেন যে, তোমাদের বিয়ে তোমাদের ওলীগণ এই পৃথিবীতে পড়িয়েছেন আর আমার বিয়ে ঊর্ধ্বলোকে হয়েছে -এটি থেকেও এই ফলাফলে উপনীত হওয়া সঠিক নয় যে, হযরত যয়নব-এর বিবাহের বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় নি। কেননা বাহ্যিক অনুষ্ঠান হলেও তার এই গর্ব করা যথাযথ যে, তার বিবাহ খোদা তা'লার বিশেষ ইচ্ছায় ঊর্ধ্বলোকে হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতে অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীনদের বিয়ে সাধারণ উপকরণের ভিত্তিতে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) অনুমতি ছাড়াই যয়নবের কাছে গিয়েছিলেন। আর এটি থেকেও এই ফলাফল বের করা হয় যে, তার বিয়ের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয় নি। কিন্তু প্রণিধানে বুঝা যায় যে, বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান পালিত হওয়া বা না হওয়ার প্রশ্নের সাথে এ কথারও কোন সম্পর্ক নেই কেননা যদি এর অর্থ এটি হয় যে, মহানবী (সা.) অনুমতি ছাড়াই হযরত যয়নবের ঘরে গিয়েছিলেন তাহলে এটি ভুল এবং ঘটনা বিরোধী কথা হবে। কেননা বুখারীর একান্ত সুস্পষ্ট এবং পরিস্কার রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, বিয়ের পর হযরত যয়নব পৈত্রিক বাড়ি ছেড়ে মহানবী (সা.)-এর ঘরে এসেছিলেন, তিনি (সা.) তার ঘরে যান নি। আর এই রেওয়ায়েতের অর্থ যদি এটি হয়ে থাকে যে, তিনি যখন বাবার বাড়ি ছেড়ে তাঁর (সা.) ঘরে এসে যান তখন তিনি (সা.) বিনা অনুমতিতে তার কাছে গিয়েছেন, তাহলে এটি কোন অস্বাভাবিক ও নিয়মপরিপন্থি কোন বিষয় নয়, কেননা যখন তিনি তাঁর (সা.) স্ত্রী হয়ে তাঁর ঘরে এসে পড়েছেন তখন এমনিতেই তার কাছে তাঁর (সা.) যাওয়ার

ছিল, তাঁর (সা.) কোন অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। অতএব অনুমতি না নেয়া সংক্রান্ত রেওয়ায়েতের এই প্রশ্নের সাথে আদৌ কোন সম্পর্ক নেই যে, তার এই বিয়ের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হয়েছিল কি না? আর সত্য কথা হলো, যেমনটি ইবনে হিশাম এর রেওয়ায়েতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে যে, খোদা তা'লার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও রীতিমত এই বিয়ের আচার-অনুষ্ঠান করা হয়েছিল আর বিবেকের দাবিও এটিই ছিল যেন এমনটি হয়। কেননা প্রথমত সাধারণ রীতি অনুযায়ী এখানে ব্যতিক্রমের কোন কারণ ছিল না। আর দ্বিতীয়ত এই বিবাহে যেহেতু একটি প্রথার উচ্ছেদ এবং এর প্রভাবকে দূর করা মূল উদ্দেশ্য ছিল, এটি পূর্বের প্রথা ছিল এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত প্রথা ছিল যে, এক পালকপুত্রের স্ত্রীর সাথে বিয়ে হতে পারে না, আর যেহেতু এই প্রথাকে নির্মূল করা ছিল উদ্দেশ্য, তাই এই বিয়ে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে এবং বহু সাক্ষ্য-প্রমাণের বর্তমানে করা অবশ্যক ছিল যেন পৃথিবীবাসী জানতে পারে যে, এই প্রথার আজ অবসান ঘটছে।

হযরত যায়েদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে, হযরত যয়নব সম্পর্কে এবং মহানবী (সা.) এর বিবাহ সম্পর্কেও আমি কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। এটি এজন্য কেননা মহানবী (সা.) এর সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে সম্পর্কে আজও আপত্তিকারীরা প্রশ্ন এবং আপত্তি করে থাকে। তাই এ সম্পর্কে আমাদেরও কিছুটা বিস্তারিত জ্ঞান থাকা উচিত। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আরো কিছু কথা রয়েছে। হযরত যায়েদ সম্পর্কেও বর্ণনা করার মতো আরো কিছু কথা রয়েছে। এই উভয় বিষয় যতটা বর্ণনা করা প্রয়োজন পরবর্তীতেও আমি বর্ণনা করব। এখন এই ধারাবাহিকতা হযরত যায়েদের বরাতে চলমান আছে।